আমি গাই গান

নির্মলাংশু মুখোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

...

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান
তার বেশী করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশী করি দান
আমি গাই গান।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বলাকা*, ২৮

এই অতিপরিচিত লাইনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি বলতে চাইছেন? যা বলতে চাইছেন তার কতটা আধুনিক গবেষণায় গ্রাহ্য? রবীন্দ্রনাথ কবি, তাঁর কাছ থেকে গোছান, বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব আশা করা ঠিক হবে না। অথচ এটাও সত্য যে উৎকৃষ্ট কবির অনুভূতিমালা প্রায়ই জাগতিক সত্যের মূলকে ছুঁয়ে যায়। এজন্যই কবিতা পড়ি, শুধু শব্দ আর ছন্দের আকর্ষণে নয়, সত্তার সন্ধানে।

যেমন এই লাইনগুলিতে মনুষ্যত্বের উৎস-সন্ধানে অমোঘ নির্দেশ পাচ্ছি, 'আমি তার বেশী করি দান'। কি সেই 'দান' যা 'স্বর' থেকে 'গানে' পৌঁছে দেয়? পাখীর কলরবে সেই দানের ঠিকানা পাই না কেন? কবিতার অপরূপ অবয়বে, শব্দচয়নে, ছন্দের খাতিরে, সেই ঠিকানা হয়তো লুকিয়ে আছে কবির অনুভুতিতে। সেই মোড়ক থেকে জাগতিক রূপটি উদ্ধার করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিষয়ের গভীরে যাওয়ার আগে তাই বিষয়টাকে গুছিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন, কবিতায় দুরকম পুরুষের উল্লেখ আছে : ‘আমি’, ‘আমার’, ‘গাই’ শব্দে আছে প্রথম পুরুষ, এক্ষেত্রে কবি নিজে; ‘দিয়েছ’ শব্দে আছে দ্বিতীয় পুরুষ, এক্ষেত্রে ঈশ্বর, দেবতা, ইত্যাদি (‘গায়’ শব্দও দ্বিতীয় পুরুষে, এক্ষেত্রে পাখী)। বিজ্ঞানের খাতিরে, বিষয়টাকে অপৌরুষেয় করার জন্য, কবিতা থেকে সরে এসে আমরা ধরে নেব যে মূল আলোচনার বিষয় হল : সংগীতের ক্ষেত্রে মানুষ আর পশুর মধ্যে কি কি বিভেদ আছে, বা আদৌ আছে কিনা। অর্থাৎ, ‘দান’ অর্থে প্রকৃতির নিয়ম। দেখব আলোচনাটা ক্রমেই ভাষার দিকে যাচ্ছে।

সাধারণিকরণের উদ্দেশ্যে বিষয়টাকে যদিও পশুর দিকে ঠেলে দেওয়া হল, পশু হিসেবে পাখীর উদাহরণ প্রায় নির্ভুল। মানুষের বাইরে পাখী ছাড়া বাকি জীবজগতে গানের সঠিক উদাহরণ পাওয়া যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, ধ্বনি ও কোলাহলের অনেক উদাহরণ অ- পাখী জীবজগতে পাওয়া গেলেও তাদের ‘গান’ বলা যায় না। ব্যাং বা ঝিঁঝিঁপোকার ডাক পরিচিত, এছাড়াও অনেক প্রজাতির কীট- পতংগ আছে যাদের ডাক খুবই ব্যাপক, নিরন্তর, আর কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেশ জটিল। তবুও, লক্ষ করুন, আমি ‘গানের’ বদলে ‘ডাক’ (call) শব্দ ব্যবহার করলাম, যেমন করি কুকুর, শেয়াল বা বাঘের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন সামুদ্রিক পশু, যেমন শুশুক (dolphin) আর তিমি (whale), এদের ক্ষেত্রেও ব্যাপক ধ্বনি- ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া যায়; কোনও কোনও গবেষক এইসব ধ্বনির মধ্যে ‘স্বরের’ লক্ষণ আছে বলেও মনে করেন, কিন্তু

সচরাচর ‘গান’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না, যদিও ‘ভাষার’ (communication system) কথা প্রায়ই চলে আসে।

যদি বিবর্তনের শাখা-প্রশাখার দিকে তাকাই, তাহলে আশ্চর্য্যের কথা এই যে শাখাটি যতই মানুষের কাছাকাছি আসে - যেমন, শিম্পাঞ্জি, ওরাং ওটাং, বা গোরিলা - ততই যেন নিঃশব্দতা ছেয়ে আসে। চিন্তা, সামাজিকতা, মস্তিষ্ক, মেরুদন্ড, আঙ্গুলের বিবর্তন যত সমৃদ্ধ হতে থাকে, ধ্বনির ব্যবহার ততই ক্ষীণ হয়ে যায়। একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই চিন্তা আর ধ্বনি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে চলে। অথচ, বিবর্তনের শাখা ধরে যত ‘নীচে’ বা ‘অন্যদিকে’ যাই, কলরব বাড়তে থাকে বেশ কিছুদূর পর্য্যন্ত। যেমন, পাখীদের শাখা মানুষের শাখা থেকে কয়েকশ মিলিয়ন বছর আগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, শিম্পাঞ্জিদের শাখা সরে গেছে মাত্র ছয় মিলিয়ন বছর আগে। সেই নিঃশব্দতা থেকে মানুষের ভাষা ও সংগীতের বিবর্তনের চেহারা কি, তা নিয়ে প্রায় কিছুই জানা নেই, সামান্য যা জানা আছে তা শেষের দিকে ছুঁয়ে যাব।

বিবর্তনের এই ব্যস্ত বিবরণ থেকে নানান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে। আমাদের আলোচনার জন্য একটি প্রধাণ প্রশ্ন হল, জীবজগতে পাখী ও অ-পাখীর ধ্বনি-সম্বন্ধীয় এই পার্থক্য ধরব কি ভাবে? ঝিঁঝিঁপোকার ডাক অথচ পাখীর গান কেন? প্রশ্নটাকে আরো তীক্ষ্ণ করা প্রয়োজন। এতক্ষণ আমরা ‘পাখী’ বলতে একটি সাধারণ জাতির কথা ভেবেছি। ভাবনাটা অতি-সাধারনীকরণে দুষ্ট কারণ সব পাখীর কলরবই গান নয়। চড়ুই আর শালিক পাখীর গানকে ‘কিচিরমিচির’ বলি, ঠিক ‘গান’ বলি না। তাহলে কোকিল, নাইটিংগেল এবং

আরো কয়েকশ পাখী- প্রজাতির কথা ভাবতে হবে যাদের যথার্থই গান- পাখী (songbird) বলা যায়। তাহলে প্রশ্নটা পাখী- অপাখী নিয়ে নয়, কিচিরমিচির আর গান নিয়ে। এর মধ্যে তফাৎটা কোথায়?

একক্ষেত্রে 'গান' শব্দের ব্যবহারও ত্রুটিমুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ও মিলের আকর্ষণে, অনুভূতির উৎসাহে, 'গান' ব্যবহার করেছেন, 'দানের' সঙ্গে যায় ভাল। কিন্তু 'গান' বলতে আমরা সাধারণত শব্দের/ভাষার ব্যবহার বুঝি। রবিশংকর বাজনা বাজান, গান করেন না। ইংরেজি 'song' শব্দটির মধ্যেও এই ভাষাগত ব্যাপারটা স্পষ্ট। এই বিচারে 'পাখী গান গায়' এই শব্দসমষ্টির কোনো মানেই হয় না, কারণ পাখীদের 'গানে' ভাষার ব্যবহার অসম্ভব; রবীন্দ্রনাথ তা বলতেও চান নি। 'গান' বলতে কবি মূলত সঙ্গীত বুঝিয়েছেন, ভাষা নয়। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ালো : কিচিরমিচির সঙ্গীত নয় কেন?

একটু ভাবলেই বোঝা যায় এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই কিচিরমিচির আর সঙ্গীতের গঠনের সঙ্গে যুক্ত। দুটোই ধ্বনি- বহুল, কিন্তু সঙ্গীতে যে ধ্বনির ব্যবহার, তা শুধুমাত্র ধ্বনি নয়, সেখানে যেন কোনোভাবে 'অর্থ' (significance) ও ধ্বনির সমন্বয় ঘটছে, এক কথায় **সুর** আসছে (কিন্তু 'ভাষা' হচ্ছে না)। এই সুর (melody) তাহলে শুধুমাত্র ধ্বনির সমাবেশ হতে পারেনা। ঠিক বলা হল না। বলতে চাইছি, কিচিরমিচিরের যে ধ্বনি- সমষ্টি সেটি সুর নয় কারণ যে ধ্বনিদের জোড়া দিয়ে কিচিরমিচিরের অবয়ব তৈরী হয় তা সুরের নির্দেশ দেয় না। গান- পাখীর সঙ্গীতের যে গঠন তাতে ধ্বনিই সুর বয়ে আনে। সেধরণের বিশেষ সুরযুক্ত ধ্বনিকে বলি **স্বর** (tone)। কিচিরমিচির তাহলে নেহাৎই

ধ্বনিসমষ্টি, সঙ্গীত হল স্বরসমষ্টি। গান- পাখীর সঙ্গীত তাহলে স্বরসমৃদ্ধ হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথের এই বিচার তাহলে আপাতদৃষ্টিতে ভুল যে স্বর শুধু ‘আমাকেই’ দেওয়া হয়েছে, পাখীদের নয়। আমাদের জানার কথা নয় পাখীরা তাদের ধ্বনিসমষ্টিকে সঙ্গীত ভাবে কি না। কিছু একটা ভাবে নিশ্চয়ই, না হলে পাখীর বাচ্চারা এই গান শিখতে এত উদগ্রীব হয় কেন? তবে এটা নিসন্দেহ যে আমরা, মানুষেরা, পাখীর গানকে সঙ্গীত ভাবি কারণ আমরা সেই গানে স্বর খুঁজে পাই।

এমন হতে পারে রবীন্দ্রনাথ ‘স্বর’ বলতে (প্রধাণত) ভারতীয় সঙ্গীতের সরগম - সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি - বুঝেছেন। ‘স্বরের’ এই অ- ব্যাপক পাঠে পাখীদের গান বাদ পড়ে যায় কারণ পাখীদের স্বর সরগম অনুযায়ী নয়, রাগরূপ তো নয়ই। এই পাঠের খানিকটা সপক্ষে বলা যায় যে মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের স্বরসমষ্টি অনেকটাই ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মেলে। আগে বলা হত যে ভারতীয় সঙ্গীত শ্রুতিসমৃদ্ধ, তাতে ২২টি স্বর আছে - তীব্র, কোমল, অতিকোমল, সব নিয়ে। কিন্তু আধূনিক গবেষণায় বিজয়কৃষ্ণণ দেখিয়েছেন যে এমনকি কর্ণাটক সঙ্গীতের স্বরসমষ্টি মোটামুটি পাশ্চাত্যের ১২- স্বরের ক্রম মেনে চলে। এই ১২- টোনের স্বরসমষ্টি তাহলে যেন মানুষের সঙ্গীতের মূল গঠনের ঠিকানা দেয়। রবীন্দ্রনাথ দুরকম সঙ্গীতের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। হয়তো তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিতে এই মিলটা ধরা পড়েছিল, তাই অনায়াসে এক ঐতিহ্য (style, tradition নয়) থেকে অন্যে চলে যেতে পারতেন।

এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা একদমই স্পষ্ট নয়। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বাইরে মানুষের সঙ্গীতের আশ্চর্য্য ব্যাপকতা ক্রমেই ধরা পড়ছে জগৎব্যাপী নিরন্তর গবেষণায়। তিব্বতী সঙ্গীতও সঙ্গীত, আফ্রিকার গামেলানও তাই। কিন্তু ওইসব সঙ্গীত শুনলে আমাদের ভারতীয় কানে তা সঙ্গীত বলে মনে নাও হতে পারে, কারণ তাদের মধ্যে আমাদের পরিচিত স্বরসমষ্টি খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। মনে পড়ে প্রয়াত অধ্যাপক শিশির ঘোষ একবার বলেছিলেন, ‘ক্যালিপসো যদি সঙ্গীত হয়, তাহলে হট্টগোল কাকে বলব?’

একটু সরে গিয়ে বলে নিই যে এইধরণের ব্যাপকতা ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, হয়তো সঙ্গীতের থেকেও বেশী। প্রাচীন ভাষাতত্ত্বে মনে করা হত সব ভাষাই ‘দেবভাষার’ অনুকরণ, পরে ল্যাটিন আর ইংরেজিকে কেন্দ্র করেও এমন ভাবা হত। গত অর্ধশতাব্দীর ব্যাপক গবেষণায় এই ভুল ভেঙ্গে গেছে। মানুষের ভাষা - সংখ্যায় দশ হাজারের কাছাকাছি, একধরণের গণনার ফলে, অন্যভাবেও গোনা যায় - অসামান্যভাবে বিচিত্র। জাপানি, ওয়ালপিরি, পুস্তু, পলিসিন্থেটিক ভাষাসমূহ, এসব আমাদের ‘সাংস্কৃতিক’ কানে ভাষা বলে মনে নাও হতে পারে, কারণ আমাদের (ওপর থেকে) চেনা ধ্বনিসমষ্টি খুঁজে পাব না। অথচ এসবই মানুষের একান্ত ভাষা। যে কোনো মানবশিশুকে বছরখানেক বয়সে যে কোনও ভাষার গোষ্ঠীতে রেখে দিলে সে অল্পসময়ের মধ্যেই হড়হড় করে সেই ভাষা বলবে। বাঁদরের ছানা বা বেড়ালের বাচ্চা কখনই পারবে না। যতক্ষণ না এই প্রাকৃতিক ঘটনার (phenomenon) সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাচ্ছি, ততক্ষণ কোনো ভাষাতত্ত্বই গ্রাহ্য নয়। এই হল চমস্কীয় ভাষাতত্ত্বের একেবারে

গোড়ার কথা; এখান থেকেই ভূ-ব্যাকরণ (Universal Grammar), জে.নারেটিভ ব্যাকরণ ইত্যাদির শুরু। সঙ্গীতেও এমন কিছু হয় না কি? ফিরে আসছি।

মানুষের সঙ্গীতের ব্যাপক বৈচিত্র্য সামনে রেখে তাহলে বলা যায় যে স্বরের ধারণাটিকেও ব্যাপক হতে হবে, শুধুমাত্র হাতেগোনা পরিচিত ঐতিহ্যের পরিধির মধ্যে ধরে রাখলে চলবে না। তাই যদি হয়, তাহলে গান-পাখীর ধ্বনিকে 'স্বর' বলতে আপত্তি থাকা উচিৎ নয়। এখনও পর্যন্ত যে প্রশ্নটা সরাসরি তোলা হয় নি তা হল : স্বর বলতে কি বোঝায়? প্রশ্নটার গভীরে যাব না এই কারণে যে এর সঠিক উত্তর প্রধাণত পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত। সংক্ষেপে, মানুষের শ্রাব্য ধ্বনির বর্ণালীকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কোনও কোনও বিশেষ তরঙ্গে (wavelength/frequency) ধ্বনি একধরণের 'বিশুদ্ধ' চেহারা নেয় যাতে কোনও 'খাদ' মেশানো থাকে না। এগুলিকে 'স্বর' (tone) বলা হয়। শুনতে মধূর লাগা ছাড়াও এদের ধর্ম হচ্ছে বিশেষ নিয়মে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে (মধূর) স্বরসমষ্টির (tonal sequence/interval) জন্ম দেওয়া। এক একটি স্বরের সঙ্গে পরিমাণমত 'খাদ' (overtone) মেশানো সম্ভব যাতে বেহালার সা আর সেতারের সা আলাদা ধ্বনি হলেও 'বিশুদ্ধ' সা-টিকে ঠিকই চেনা যায়।

পদার্থবিদ্যার নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ প্রধাণ হলেও তা স্বর-ভাবনার একমাত্র উৎস নয়। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, অন্তিম মাপকাঠিতে, কোন ধ্বনিটি স্বর হবে তা একান্তভাবে মানবনির্ভর। প্রথমত, কোনও ধ্বনির প্রাকৃতিক ধর্ম যাই হোক, তা আমাদের কাছে স্বর হয়ে আসে মধূরতার নিরীক্ষে। এই বিচারে গান-পাখীর কোনও ধ্বনি যদি **আমাদের** কানে মধূর লাগে, তাহলে

তাকে ‘স্বর’ বলতে বাধা কোথায়? লক্ষ্য করুন, গান-পাখীদের কাছে এই ধ্বনি মধূর লাগে কি’না তা আদৌ বিচার্য্য নয়, আমাদের বিচারই আসল ও শেষ কথা। দ্বিতীয়ত, মধূর স্বরগুলির কোন সমষ্টি (mode, scale, ইত্যাদি) যথার্থ হল তা শুধু মানব-নির্ভর নয়, বেশ খানিকটা ঐতিহ্য-নির্ভর। সাম্প্রতিক সঙ্গীততত্ত্বের দুই অগ্রনী গবেষক লেরডাল ও জ্যাকেনডফ জানাচ্ছেন যে সঙ্গীতের বিশ্বব্যাপী স্বরসমষ্টিসমূহকে (scales) শুধুমাত্র ভৌতিক ধর্ম - যেমন, overtone series - দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মানবনির্ভরতার এই মানদন্ডে যদি গান-পাখীর ধ্বনিতেও সঙ্গীত শুনতে পাই, তাহলে তা স্বরসমৃদ্ধ হতে বাধ্য। মানুষের অধিক ‘দানের’ ব্যাখ্যা সেইজন্য স্বর দিয়ে করা যাবে না।

এই পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এ অনুভূতি থেকেই যায় যে কবি শেষপর্য্যন্ত ঠিক কথাই বলেছেন - গান-পাখীর থেকে মানুষের দান শুধু অনেক বেশী নয়, তার কাঠামোগত চরিত্রই আলাদা। প্রায় একই কথা ভাষা নিয়েও বলা যায়। আগেই বলেছি শিম্পাঞ্জিদের নিরবতা বিস্ময়কর। কিছু গবেষক মনে করেন তার একমাত্র কারণ শিম্পাঞ্জিদের ধ্বনিগ্রহণ বা প্রকাশের ভৌতিক যন্ত্রটাই শুধু নেই, ভাষার অন্যান্য সামগ্রী- শব্দ, ব্যাকরণ, ইত্যাদি - সবই আছে। অর্থাৎ, কোনওভাবে শিম্পাঞ্জিদের কন্ঠে ধ্বনিযন্ত্র (vocal chord, vibrating ear drum, ইত্যাদি) বসিয়ে দিলে তারা অনেকটাই ভাষা শিখতে ও বুঝতে পারবে - অবশ্যই তাদের নিজেদের ভাষা যা মানবভাষার থেকে খুব তফাৎ হওয়ার কথা নয় বিবর্তনের সান্নিধ্যের ফলে।

এই ভাবনাকে পরীক্ষা করার জন্য গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে এক অনবদ্য অনুসন্ধান চলছে। এর প্রধাণ উপাদান হল সাংকেতিক ভাষা (sign language)। শিম্পাঞ্জিদের ধ্বনিযন্ত্রের অভাবের ব্যাপারটা সেইসব মানবশিশুর জন্যও খাটে যারা নানান অসুস্থতার কারণে কানে শুনতে পায় না এবং, অনেক ক্ষেত্রে সেই কারণে, কথাও বলতে পারে না। অসামান্য পরীক্ষা- নিরীক্ষায় দেখা গেছে এইসব শিশুরা মানুষের বানানো সাংকেতিক ভাষা শিখে নিতে পারে, যে ভাষার শব্দবৈচিত্র্য আর জটিলতা উচ্চারিত ভাষার সঙ্গে মেলে। এমনকি এটাও দেখা গেছে যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে যখন এইসব শিশুকে সাংকেতিক ভাষা হাতে ধরে শেখানো হয় নি, তখন তারা নিজেরাই কাজ চালানোর মত সাংকেতিক ভাষা বানিয়ে নিয়েছে। শিশুদের শারীরিক অবস্থা যাই হোক, তাদের ক'জন একত্র হলে 'কথা' বলতেই হবে, কত কথা বলার আছে।

শিম্পাঞ্জিদের যদি ধ্বনিযন্ত্র বাদে 'আর সব কিছু' ঠিক থাকে, তাহলে মূক মানবশিশুর মত তাদেরও সাংকেতিক ভাষা শিখতে পারা উচিৎ। এই সূত্র ধরে প্রায় শতাব্দীব্যাপী নিবিষ্ট গবেষণায় যা জানা গেছে তা হল, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও পরীক্ষাগারে সযত্নে- লালিত বেছে নেওয়া শিম্পঞ্জিদের কারুকেই কয়েক'শর বেশী 'শব্দ' শেখানো যায় নি, যার মধ্যে ব্যাকরণগত শব্দ (grammatical categories) নেই। শুধু তাই নয়, বছরের পর বছর একটি শিম্পাঞ্জির ওপর পরীক্ষা চালিয়েও তাকে দু- 'শব্দের' বেশী 'বাক্যগঠন' করতে বা বুঝতে দেখা যায় নি।

মানবশিশু ভাষায় প্রবেশ করার বছর দুয়েকের মধ্যে - কোনও কোনও সময় একাধিক ভাষার - কয়েক হাজার শব্দ আর প্রায় অন্তহীন জটিল বাক্যগঠন অনায়াসে শিখে ফেলে। বছর তিনেক বয়সের বাঙালীশিশু সহজেই ‘তুমি তাহলে মাসির বাড়ী যাবে না’ এই বাক্যটি বুঝে তার উত্তরে বলে ‘না, ওখানে খেলার কেউ নেই’। এটা আমাদের মাথায় আসে না যে এই অত্যন্ত জটিল বাক্যসমষ্টির ব্যবহার দেখিয়ে ক্ষুদ্র মানবশিশু বিবর্তনের হিমালয় পার করে এল। এটাই মানবশিশুর তুলনাহীন ‘দান’।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এ- কথা অনেকটাই খাটে, যেমন রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়েছিল। এ- কথা ঠিকই যে গান- পাখীর স্বর- জটিলতা অনেক ক্ষেত্রেই শিম্পাঞ্জীর শব্দ- জটিলতার থেকে অনেক বেশী। কোনও কোনও ব্যতিক্রমী গান- পাখী প্রজাতির ক্ষেত্রে এও দেখা যায় যে দুটি পাখীর মধ্যে ‘সওয়াল- জবাব’ বেশ কয়েক মিনিট ধরে চলতে থাকে। সঙ্গীতের জাগতিক অর্থ- নির্ভরতা (natural meaning) কম, তাই খেলাচ্ছলে - নাকি মনের আনন্দে - স্বর- জটিলতা নিজের স্ফূর্তিতে শুধু ছন্দের নিয়মে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এইসব জটিল স্বর- বিন্যাসকেও খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে

(১) এই জটিলতা দুটি বা তিনটি সরলতর বিন্যাসকে বারবার জুড়ে (repetition) তৈরী হয়। একটির মধ্যে আর একটি প্রবেশ (embedding) করে না।

(২) সরলতর বিন্যাসগুলি ইউনিট হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ, সেগুলি আর আরো সরল বিন্যাসে বিভক্ত হয় না। তার মানে, বিন্যাসগুলিই ‘স্বর’ হিসেবে কাজ করে।

(৩) এক প্রজাতির স্বর- জটিলতা একেবারে নির্দিষ্ট, পাখীর ছানা থেকে বুড়ো পাখী, বংশ থেকে বংশান্তরে, তার কোনো হেরফের হয় না

ভাষাতত্ত্বের ভাষায় বলা যায় এই আপাত- জটিল বিন্যাসে না আছে শব্দ- জটিলতা (morphology), না আছে ব্যাকরণ (syntax)। এই হল পাখীকে ‘দেওয়া’ গান, অমোঘ প্রাকৃতিক নির্দেশ, এর কোনো অন্যথা নেই, যা ছিল তাই আছে কয়েক লক্ষ বছর ধরে।

এইভাবে আমরা আলোচনার মূলে পৌঁছে গেলাম। গান- পাখীর সঙ্গীত আর মানবসঙ্গীতের প্রধাণ পার্থক্য স্বর নিয়ে নয়, স্বরবিন্যাসের গঠন নিয়ে। আমরা দেখলাম জটিলতম ক্ষেত্রেও গান- পাখীর স্বরবিন্যাস খুবই সীমিত, অনেকটা শিম্পাঞ্জির শব্দবিন্যাসের মত যদিও পাখীদের ‘শব্দ’ আকারে খানিকটা জটিল হতে পারে (সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, পাখীদের ভাষার কোনও উদাহরণ নেই)। হতে পারে যে পাখীদের স্বরের ধ্বনিগঠন (sound pattern) এমন যাতে স্বরবিন্যাস খুব বেশীদূর যেতে পারে না - স্বরবিন্যাসের অন্তহীন বৃদ্ধির (progression) জন্য স্বরগুলি কয়েকটি বিশেষ মাপে (ratio) সংলগ্ন থাকা প্রয়োজন। তা যদি হয় তাহলে গান- পাখীর সঙ্গীত আর মানবসঙ্গীতের পার্থক্যর অন্তত খানিকটা ব্যাখ্যা স্বর নিয়ে হবে ঠিকই। তবে সেক্ষেত্রেও প্রধাণ

পার্থক্য হবে স্বরবিন্যাসের গঠনযোগ্যতা নিয়ে। এ নিয়ে সঠিক বলার মত প্রায় কিছুই জানা নেই।

মানবসঙ্গীতের গঠন, মানুষের ভাষার মতই, সম্পূর্ণ আলাদা। অবশ্যয়ই এ- ব্যাপারে ভাষার ক্ষেত্রে যা কিছু জানা গেছে দীর্ঘ অনুশীলনে (সেই পানিনি থেকে), সঙ্গীতের ভূ- গঠনের (universal structure) গবেষণা আরম্ভ হয়েছে অতিসম্প্রতি। তা সত্ত্বেও এই গবেষণা এর মধ্যেই বেশ টেকনিকাল চেহারা নিয়েছে যার গভীরে প্রবেশ করার প্রস্তুতি এখানে আমাদের নেই। একটি পরিচিত উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

ভারতীয় সঙ্গীতে ইমন - কর্ণাটক সঙ্গীতে কল্যানী - একটি অতিপ্রচলিত রাগ। তার গঠনও অপেক্ষাকৃতভাবে সরল। এই রাগে সপ্তকের সব কটি স্বরই লাগে, শুধু মা তীব্র হয়, বাকি সব শুদ্ধ স্বর। আরোহণ- অবরোহণ নিয়ে সামান্য মতান্তর আছে, কিন্তু সকলেই মানেন যে নি- রে- গা- রে- নি- রে- সা এই পদটি রাগটির চিহ্নরূপ (পকড়)। কিছুই গাইতে পারিনা, তবু আমার অক্ষম কন্ঠে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সাধারণ সভায় এই পদটি গেয়ে শুনিয়ে যখন রাগের নাম জানতে চেয়েছি অনেক সময়ে দু- তিনশো লোকের সামনে, অধিকাংশ একবাক্যে ইমনের নাম করেন। এমনকি, রাগের স্বরবিস্তার (সা- রে- গা- মা$^{+}$- পা- ধা- নি, + মানে তীব্র) বলার পর যেই নি- রে- সা এই ক্ষুদ্রতর পদটি উচ্চারণ করি, ইমনের নাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবিত হয়।

কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এইজন্য বলা যে সেই একই স্বরসপ্তকের (ওটাই তো হাতে আছে অভিধান হিসেবে) সামান্য হেরফেরে

কয়েক হাজার রাগ- রাগিণীর মধ্যে একটি বিশেষ রাগ অনায়াসে চিহ্নিত হয়ে যায় শুধুমাত্র গঠনের কারুকার্য্যে। এই গঠনের কোনও শেষ নেই। পরবর্তী লাইনদুটি ইমনের একটি অতিসরল আলাপের প্রথম অংশ থেকে নেওয়া, যা প্রাথমিক ছাত্রছাত্রিদের শেখানো হয়। স্বরের আগে ' চিহ্নটি মন্দ্রসপ্তকের নির্দেশ, স্বরের পরে থাকলে হবে তারসপ্তক।

(১) সা, 'নি- রে- সা, 'নি- রে- গা- রে- 'নি- রে- সা, সা- 'নি- 'ধা- 'নি- 'ধা- 'পা, 'মা+- 'ধা- 'নি- রে- 'ধা- 'নি, রে- গা- রে, সা

(২) মা+- ধা- নি- রে'- ধা- নি- সা', নি- রে'- গা'- রে'- নি- রে'- সা, ইত্যাদি

এইধরণের উদাহরণ থেকে সঙ্গীতের গঠন নিয়ে অনেক কিছু শেখার আছে। আপাতত, একটি প্রধাণ ধর্মের কথা উল্লেখ করব। একটু ভাবলেই বোঝা যায় উপরোক্ত প্রক্রিয়ার কোনও অন্ত নেই যতক্ষণ শ্বাস আছে। অর্থাৎ, সঙ্গীতের নিজস্ব কোনও সীমা নেই, সঙ্গীত শেষ হয় মানুষের দৈহিক সীমার জন্য। অথচ, যেমন বলেছি, হাতে আছে সেই অত্যন্ত সসীম স্বরসপ্তক।

ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝার জন্য উল্লিখিত জটিলতাকে সহজেই ধাপে-ধাপে সাজিয়ে নেওয়া যায় যেখানে প্রথম উচ্চারিত স্বর বা পদটি পরবর্তী উচ্চতর পদের ডানদিকে তলায় আশ্রয় নিচ্ছে, অর্থাৎ পদটি বাঁদিকে (left embedding) আকাশপানে বাড়ছে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, পদগুলি হবে এইরকম :

সা, রে- **সা**, 'নি- **রে- সা**, রে- **'নি- রে- সা**, . . . 'নি- রে- গা- **রে- 'নি- রে- সা**

ইত্যাদি। সঙ্গীতের ‘গাছ’টি তাহলে খানিকটা এরকম হবে (অনেক প্রয়োজনীয় ডিটেল বাদ দিয়ে),

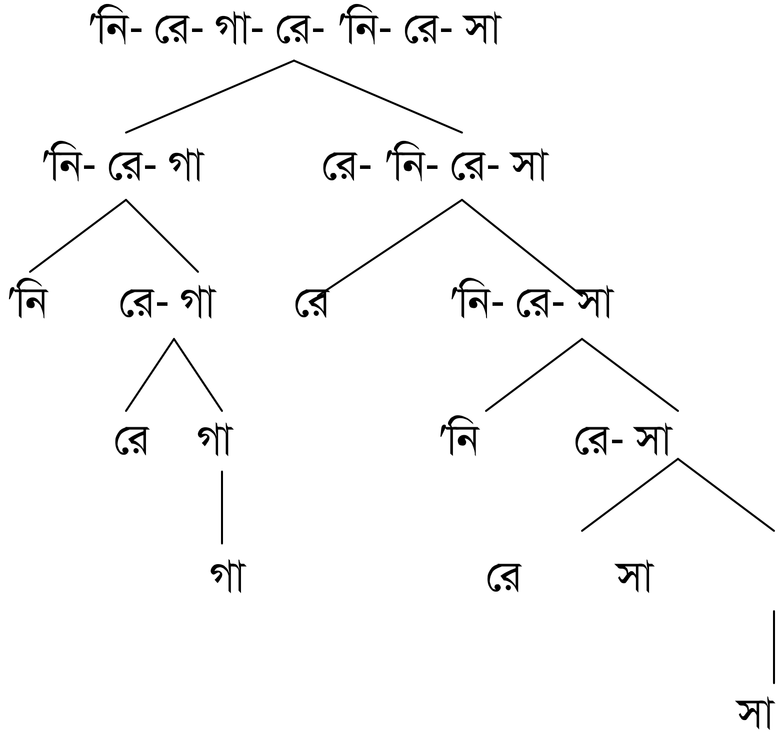

স্পষ্টত, এই ক্রমবর্ধমান গাছের কোথাও না কোথাও ইমন রাগের সমস্ত অসংখ্য পদের জায়গা হবে। অথচ, একেবারে বাঁদিকের শাখা-প্রত্যন্ত স্বরগুলির অবস্থান থেকে এটাও পরিষ্কার যে ঘুরেফিরে সেই হাতেগোনা স্বরগুলিই এই অসীম সংকেতসমষ্টির একমাত্র উৎস। উনবিংশ শতাব্দির জার্মান মণীষী ফন হুমবল্ট ভাষার এই সাংকেতিক ধর্মকে বলেছিলেন সসীম ব্যবস্থার অসীম ব্যবহার (infinite use of finite means)। হুমবল্টের উক্তি চমস্কির মাধ্যমে আজ বেশ পরিচিত। সর্বাধূনিক ভাষাতত্ত্বে এই অসীম ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করা হয় প্রকৃতি-

প্রদত্ত একটিমাত্র সূত্রের সাহায্যে। এই সূত্রটির নাম 'মার্জ' (merge) যার কাজ হল এক একটি শব্দ জুড়ে জুড়ে পদ (phase) আর বাক্য সৃষ্টি করা।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একই কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর নিজস্ব অনুভূতির ছন্দে, গান গেয়ে বুঝিয়েছিলেন গানের মৌলিক ধর্ম,

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।

আগেই ঠিক করেছি দ্বিতীয় পুরুষের জায়গায় প্রকৃতির নিয়ম ধরে নেব। সুরের সীমা-নির্ভর অসীমতা মানবসঙ্গীতে প্রকৃতির দান। গানটির দ্বিতীয় লাইনও আমাদের কাজে আসে,

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধূর।

'আমি' বলতে মানুষের গানের মধূরতার ব্যাখ্যা তাহলে শুধু স্বরে নয়, **সুরে**, আপন সুরে। এই সুর প্রকৃতির মধূর প্রকাশ। অসীমের ঘোর লাগা এই প্রকাশ হয়ত একঅর্থে প্রকৃতির সীমাও ছাড়িয়ে যায় কল্পনার চিত্রপটে, অন্যলোকের সন্ধানে। শিম্পাঞ্জির সংকেতব্যবহারে বা গান-পাখীর গানে এই অসীমের ছোঁয়া নেই। সেখানেও মধূরতা আছে, কিন্তু সেই মধূরতা প্রকৃতির কঠোর নিয়মে আক্ষরিকভাবে সীমাবদ্ধ।

বিবর্তনের বিষয়ে ফিরি। আগেই বলেছি শিম্পাঞ্জির শাখা সরে যাওয়ার পরবর্তী ছয় মিলিয়ন বছর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নেই কারণ (১) শিম্পাঞ্জির পরবর্তী মানেবতর সমস্ত প্রজাতি লুপ্ত, (২) ভাষা বা সঙ্গীত সরাসরি কোনও ফসিল রেখে যায় না। তাহলেও অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে অতিসম্প্রতি জানা

যাচ্ছে যে মানুষের ভাষার উদ্ভব কোনওভাবেই এক লক্ষ বছরের বেশী নয়, হয়ত আরো পরে, এমনকি মাত্র চল্লিশ হাজার বছর আগে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মনে হয় সময়টা হয়ত ষাট- সত্তর হাজার বছর আগে। গড়পড়তায় দুইয়েরই জন্ম কাছাকাছি সময়। এমনকি হতে পারে যে দুইয়ের উৎস একই? এবিষয়ে বাংলায় এর আগে খানিকটা বলেছি অন্যত্র (*আলোচনা- চক্র*, ২৮, ভাষাতত্ব সংখ্যা, ২০১০)।

এবারের জন্য আলোচ্য প্রশ্ন হল : যে মার্জ ভাষার ক্ষেত্রে কাজ করে বলে জানি, সেকি সঙ্গীতেও শব্দের জায়গায় একটার পর একটা স্বর জুড়ে জুড়ে স্বরবিন্যাস গঠন করে? শব্দ আর স্বর নিশ্চয়ই আলাদা জিনিষ, কিন্তু তাদের জোড়ার কাজটা তো একই, তার জন্য আলাদা যন্ত্র লাগবে কেন? যে প্রকৃতির পরিমিতিবোধ আর কৃপণস্বভাব বিজ্ঞান অন্য ক্ষেত্রে সোচ্চারে প্রচার করে, তা হঠাৎ ভাষা ও সঙ্গীতে এসে বদলে যাবে কেন? এছাড়াও আরো অনেক যুক্তি আছে এই ভাবনার সপক্ষে।

সেইসব যুক্তি অনুযায়ী এটা মনে করা অনুচিত হবে না যে আজ থেকে প্রায় লক্ষ বছর আগে বিবর্তনের এক অমোঘ মুহূর্তে মানুষের মস্তিষ্কে একটি সরল নিয়ম, মার্জ, প্রবেশ করে। বিবর্তনের ব্যাপ্ত পরিধির বিচারে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই নিয়ম মানুষের কল্পনাশক্তিকে প্রায় অন্তহীন ক্ষমতা প্রদান করে। মহাকালে বিস্ময়ে ভ্রমণরত কবির কল্পনায় বিবর্তনের এই অতুলনীয় মুহূর্ত্ত স্পষ্ট ধরা পড়েছিল।